ঋতুপর্ণা ভট্টাচার্য

সম্পর্ক শব্দের গভীরতা অনুধাবন করার আগেই আমায় স্কুলে ভর্তি করা হয়েছিল আড়াই বছরে। আমি একদিনও স্কুল কামাই করতে চাইতাম না। বরং কোনওদিন জ্বরটর হলে মা যদি যেতে বারণ করত আমি বলতাম, 'টাকাগুলো বসে বসে আরতিদি খাবে আর আমি স্কুল যাব না? ইশ!' আরতিদি ছিলেন আমার সেই স্কুলের ক্লাস টিচার। এই পর্যন্ত পড়েই হয়তো আঁচ পাওয়া যাচ্ছে আমি শিক্ষকদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক নিয়েই লিখব। কিন্তু সেই এঁচোড়ে পাকা বাচ্চা হিসেবে শৈশবে যা যা বলেছিলাম পরবর্তী জীবনে সেই ভুল আর করিনি।

আমার জীবনের সব শিক্ষাগুরু আর তাঁদের পরিবার আমার জীবনের অনেকটা জুড়ে। আমার বায়োলজির গৃহশিক্ষক ছিলেন ডাক্তারি পড়ুয়া এক ছাত্র। যত্ন নিয়ে খুব ভালো পড়াতেন। কিন্তু নিজে 'হাঁদাভোঁদা' পড়তেন বলে আমি মোটেও ভয় পেতাম না তাঁকে। আমায় কিছুতেই কাবু না করতে পেরে শেষে তিনি এক অদ্ভুত শাস্তি বেছে নিয়েছিলেন। যেদিন পড়া করতাম না সেদিন আমায় দেশলাই জ্বালাতে হত। ঘটনা হল, আমি ক্লাস টেনে উঠলেও ওই কাজটি পারতাম না একদম। অন্যদিকে ছিলেন আমার এক অঙ্কের দিদিমণি। তাঁর সঙ্গে আমি জীবনে অঙ্ক কম আর নারী স্বাধীনতা থেকে সরস্বতী পুজোয় 'কাঁটা লাগা' বাজানো উচিত কিনা এমন উচ্চাঙ্গের (?) গল্প অনেক বেশি করেছি। কিন্তু তাঁর পড়ানোর গুণ এতটাই ছিল তারপরেও সিলেবাস শেষ হয়ে যেত ঠিকসময়ে। আবার কেমিস্ট্রি পড়াতেন যে দিদি তাঁর এতই গুণমুগ্ধ ছিলাম, শুধু তাঁর মতো হব বলে পোস্ট ডক্টরাল অবদি করে ফেললাম রসায়ন নিয়েই। অবশ্য সেখানেও আমার কীর্তির ছাপ রয়েছে। তাঁর বিয়ের কার্ড হাতে নিয়ে বলে বসেছিলাম 'তুমিও শেষে অ্যারেঞ্জেড ম্যারেজ করছ?' ছাত্রীর অযাচিত প্রশ্ন এবং অসভ্যতায় নম্র স্বল্পভাষী দিদিমণিটি ঘাবড়ে বলেছিলেন, 'প্রেম না হলে কী করব?'

এই হেন আমি কলকাতা কাঁপিয়ে যখন অমিত লাবণ্যের শহর শিলংয়ে পড়তে গেলাম তখন সেখানে তিনজন মানুষের আর তাঁদের পরিবারের কথা আমার মনে গেঁথে আছে। সেই স্মৃতি আজও আগেকার দিনের গুরুগৃহে থেকে পড়াশোনার কথা মনে করিয়ে দেয়। যত সময় ইউনিভার্সিটিতে কাটিয়েছি তার চেয়ে বেশি থাকতাম স্যারদের বাড়িতে। পড়াশোনার সাহায্য ছাড়াও বাড়ি থেকে অতদূরে গিয়ে যে মানসিক সাহচর্য পেয়েছি তার কোনও তুলনা হয় না। একবার শিলংয়ে জলের কিছু সমস্যা হল। ডিপার্টমেন্ট থেকে নিজের গাড়িতে চাপিয়ে আমার জন্য ভারী আর বড় বড় বোতলে জল বয়ে নিয়ে আসতেন চন্দ্র স্যার। আমি থাকতাম ওঁর বাড়ির লাগোয়া একটি ঘরেই। অন্য আর একটি গল্প বলি। ট্রেনে আমরা কিছু স্টুডেন্ট আর স্যাররা একসঙ্গে ফিরছি কলকাতায়। ভোরবেলা দেখি আমার গায়ে চাদর জড়িয়ে দিচ্ছেন মিত্র স্যার আর কাকিমা। ঠিক যেমনটা হালকা শীতের ভোরে বাবা দিয়ে দিত আমায়। ছিলেন রহমান স্যার। মনখারাপ করে একলা বসে থাকা জন্মদিনে আমার জন্য কেক কিনে এনেছিলেন তিনি। কাছে কাছে ঘুরত স্যারের মেয়ে মৌমি। রোজা ভাঙার বিকেলে হালিম আর খেজুর খেতাম ওঁর বাড়িতেই। এঁদের সঙ্গে ছিলেন মিত্র কাকিমা, চন্দ্র কাকিমা আর রহমান কাকিমা। কত রান্না যে করে খাইয়েছেন তার হিসেব নেই। আর চন্দ্র স্যারের স্ত্রী ছিলেন আমার যাবতীয় অসুবিধের ওয়ান স্টপ সলিউশন। ছিল পুঁচকে পুঁচকে সইফ, তির্না আর দিশা। তাদের নতুন ব্যাংক বানানো থেকে ট্যাটুর ডিজাইন, আমার সঙ্গে রান্না করা, হোলিখেলা আরও কত কী! পাহাড়ের ঢালে গড়িয়ে যেত আমার কলকাতাকে মিস করার সব কষ্টগুলো।

তারপর গেলাম মরুর শহরে। এখানেও সেই আদরের আঁচল পেলাম কাকিমাদের কাছে। তখন সদ্য বিয়ে করেছি। রোজ মনে হয় পিএইচডি করা ছেড়ে দেব। বরের সঙ্গে আমেরিকা গিয়ে থাকব। এত প্রশ্রয় আর ছুটি দিয়েছেন আমার গাইড সেসব ভাবলে আজ নিজেকে বড় ভাগ্যবতী মনে হয়। সেই ভরসা না পেলে হয়তো সত্যিই আর গবেষণা করা হত না। আর একটা কথা যেটা না বললেই নয় সেটা হল বিটস পিলানির দুর্গাপুজো। ওইটুকু গ্রাম্য জায়গায় অমন এলাহি আয়োজন আর অমন মায়ামাখা বাড়ির পুজোর আমেজ সারাজীবন আমি আর দেখিনি। আর কি মনোরম সব সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হত তখন! এখনও সেই মাঝরাত্তিরের ঢাকের শব্দ, সন্ধিপুজোর আলো আর আমাদের হাসিগুলো বুকে বয়ে নিয়ে চলি। একবার থিসিস জমা দেওয়া নিয়ে খুব টেনশন। আমার কলকাতার প্রতিবেশী ছিলেন ওখানকার একজন স্যার। কিন্তু তিনি তখন দুবাই ক্যাম্পাসে। কাকিমাকে বলেছিলাম টানাপোড়েনের কথা। অত ব্যস্ততার মধ্যেও দুবাই থেকে ফোন করেছিলেন স্যার। যেই ভরসাটুকু পেয়েছিলাম সেটা আজও জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি বলে মনে হয়। ছিলেন একজন অবিবাহিত ম্যাডাম। দু'জন মিলে অটো ভাড়া করে মাছ কিনতে যেতাম আর উইকএন্ডে মাঝেমাঝেই একসঙ্গে খেতাম জমিয়ে। একটা অনবদ্য রান্না শিখিয়েছিলেন আর একজন কাকিমা। আলু দিয়ে যে অমন সুস্বাদু খাবার হয় কে জানত! একবার আমার খুব শরীর খারাপে পাতলা ঝোল রেঁধে এনেছিল সেই কাকিমারই মেয়ে। আজও যেন স্বাদটা লেগে আছে মুখে।

সেই মাঝরাত্তিরের ঢাকের শব্দ, সন্ধিপুজোর আলো আর আমাদের হাসিগুলো বুকে বয়ে নিয়ে চলি। একবার থিসিস জমা দেওয়া নিয়ে খুব টেনশন। আমার কলকাতার প্রতিবেশী ছিলেন ওখানকার একজন স্যার। কিন্তু তিনি তখন দুবাই ক্যাম্পাসে। কাকিমাকে বলেছিলাম টানাপোড়েনের কথা। অত ব্যস্ততার মধ্যেও দুবাই থেকে ফোন করেছিলেন স্যার। যেই ভরসাটুকু পেয়েছিলাম সেটা আজও জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি বলে মনে হয়।

লেখার জগতে মানসগুরু ছিলেন একজন, একটি নামী পত্রিকার সব নামী বাংলা ম্যাগাজিনের সম্পাদক, প্রাবন্ধিক আর কবি। লেখা দিলে বলতেন, 'ভালো হয়েছে তবে আরও ভালো হতে পারত।' সেই ভালো লেখার চেষ্টা আজও আমি করে যাই। কিন্তু বলার লোকটি আজ আর ইহজগতে নেই।

কবিতা

একটি নির্জন সন্ধি পিষে চলে যায় ধর্ম কিংবা জাতে

যাত্রাকল্প
সুব্রত সেনগুপ্ত

প্রতিটি পদক্ষেপে
দীর্ঘায়িত হচ্ছে পথ
আলোছায়া মেশানো গাছগুলোর মতো
দিনগুলো সরে সরে যাচ্ছে।
লাল কাঁকুরে পথ
শীতল সর্পিল শরীর এগিয়ে
আদিগন্ত বিস্তৃত।
এখন কণ্টকাকীর্ণ সময়
প্রহরে প্রহরে কণ্ঠলগ্না হয়
নীলমৃত্যুর শীতল নিঃশ্বাসে।
দম আটকে আসা কালো অন্ধকারে
ডুবে যেতে যেতে
চোখে ভেসে ওঠে
ধবল কাশের গুচ্ছ আর
মেঘের অনন্তশয়ান।

রাত্রি নেভাই
অমিত কুমার বর্মন

রাত্রি নেভাই হাতড়াতে হাতড়াতে
একটি নির্জন দুপুর হত্যা করি রক্তমাখা রোষে
একটি নির্জন সন্ধি পিষে চলে যায় ধর্ম কিংবা জাতে,
একটি নির্জন বয়স ধারণ করি আদিম আফশোসে
প্রলাপে প্রলাপে শুধু আয়ুক্ষয়
ছিল ঠোঁটের ভিতর ছিল শরীরী আদর
ঝিঁঝি পোকার সমবেত সুরে
রক্তঝোরা বুকে রক্তঝরা তির
কাঁপিয়ে দিয়ে যায়, ফিরে ফিরে আসে,
পাপ-অপাপের গভীরতর রাতে
রাত্রি নেভাই হাতড়াতে হাতড়াতে

সমাধান
রণজিৎ কুমার সরকার

আয়ুর থলি খালি হলে
উড়ে যায় পাখি হিসেব ফেলে
না ফেরার ঠিকানায় –
শূন্য নীড় ঘিরে ভালবাসার
ক্রৌঞ্চি ক্রন্দন আর তার
মেঘলা চোখে শ্রাবণ ধারা।
মৃত্যুর বীজ ঠোঁটে নিয়ে পাখি
মিশে যায় নীল নীলিমায়
চেতনা মেশায় জড়ে –
জীবনের সব সমাধান
রেখে যায় শ্মশানে ও কবরে,
আসার শুভক্ষণে পাখি আনে
ঠোঁটে করে অঢেল
মায়া ও মমতার বীজ।

বিষাদ-বিশ্বাস
তন্ময় বিশ্বাস

ভালোবাসার কাছে নত হয়ে গিয়ে দেখেছি, পুকুরে
ডুবে গেছে সমুদ্র, মাছরাঙা'র দু'ঠোঁটের মাঝে –
ঝুলে আছে বিশ্বাস।
এতদিন দেখিনি শিমুলের ডালে কত বিষাদ বসে থাকে –
মেঘের মধ্যে থেকে ছুটে আসা বৃষ্টিরা, আমার টালির চাল
থেকে শুষে নেয় উষ্ণতাপ, বহুযুগের প্রেম, প্রেম-সমুদ্রতট।
এখন দেখি প্রতিদিন-ই সূর্য ওঠে, এটা বিশ্বাস রেখেই –
জানি একদিন এ পৃথিবী ভরে যাবে অন্ধকার শীতাতপে।
তবুও বিদ্যুৎ-বেগে দেখেছি অসম বিদ্রোহ, ভিটামিনের অভাবে
ধুঁকতে থাকা প্রেম-গুহা-জঙ্গল-নদী-সমুদ্র আর আমার মায়ের শরীর।

অঙ্কন ঃ শংকর বসাক